যায়যায়দিন

3 JAN 2013

শিক্ষার মানের প্রকৃত সূচক কী? বছর শেষে বার্ষিক বা পাবলিক পরীক্ষার ভালো ফল, জিপিএ প্রাপ্তির সংখ্যাধিক্য, পাসের হারের বৃদ্ধি নাকি অন্য কিছু? বিগত কয়েক বছরে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী, জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) ও (জেডিসি) জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট, এসএসসি এবং এইচএসসি ও এর সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরপরই সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের তরফ থেকে শিক্ষার মানের অগ্রমুখীনতার কথা বলা হচ্ছে। প্রতি বছর এসব পরীক্ষার পাসের হার বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ জিপিএ'র সংখ্যাধিক্যের কারণে শিক্ষার মান নিয়ে সরকার মহল থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৭ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জেএসসি, জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রথমবারের মতো একই দিনে প্রকাশিত হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবারের ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পাসের হার, জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর

ভালো ফল কি মানসম্মত শিক্ষার সূচক?

আশরাফুল আযম খান

সংখ্যা ও শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং একজনও পাস করেনি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে আসায়, দেশের শিক্ষার মানের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন।

আসলেই কি দেশের শিক্ষার মান বাড়ছে? সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হ্যাঁ বললেও আমার মতো অনেকে সহমত পোষণ করতে পারছেন না। বিতর্কটি একটু খতিয়ে দেখা যাক। প্রথম কথা, পাসের হার বৃদ্ধি ভালো ফলের সূচক। তবে তা শিক্ষার মানোন্নয়নের সমার্থক নয়। কেননা যে কোনোভাবেই পাসের হার বৃদ্ধি হতে পারে। পাস করা বিদ্যা আর প্রকৃত বিদ্যা এক কথা নয়। বর্তমানে পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন কাঠামো বা মানবণ্টন যেমন তাতে পাসের জন্য প্রয়োজনীয় শতকরা ৩৩ নম্বর সহজে পাওয়া যায়। লিখিত অংশের পাশাপাশি প্রায় সব বিষয়ে ৩৫ হতে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদ্ধতি প্রচলিত থাকায় না-পড়েই শিক্ষার্থীরা একজনের দেখে আরেকজন লিখতে পারে।

পরীক্ষার হলগুলোর আসনবিন্যাস সঠিকভাবে বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী করা হয় না। একটি আসন হতে অন্য আসনের যে দূরত্ব থাকার কথা তা কোথাও রক্ষিত হয় বলে আমার জানা নেই। পরীক্ষা চলাকালে মন্ত্রী বা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিদর্শনের প্রয়োজনে দু'-একটি কেন্দ্রে হয়তো যাওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য ও আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় তা রক্ষা করা হয় না। একই কক্ষে সমশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে বসার কারণে পৃথক প্রশ্নপত্রের সেট দিয়ে পরীক্ষা নিয়েও তেমন কাজ হয় না। পরীক্ষার হলের পর্যবেক্ষকের সতর্কতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা সহজেই যায়। আমাদের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ভালো ফল লাভ করলেও এ পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক দক্ষতার সবগুলো অর্জন করতে পারছে না। পঞ্চম শ্রেণী পাস করেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতো সাধারণ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। দুটি বাক্যে নিজের কথা গুছিয়ে লিখতে পারে না। উক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হলেও শিক্ষার বিষয়গুলো সহজভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ব্র্যাকের একটি গবেষণায় এ কথা বলা হয়েছে। যদি এমন হতো শিক্ষার্থী সব প্রান্তিক দক্ষতা অর্জনপূর্বক ভালো ফল লাভে সক্ষম হচ্ছে তাহলে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করতে পারতাম। এ অবস্থা নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক এমনকি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ জিপিএধারী কোনো শিক্ষার্থী যখন নির্ভুলভাবে মাতৃভাষায় একটি দরখাস্ত লিখতে পারে না। একটি চৌবাচ্চার পানির আয়তন পরিমাপ করতে পারে না। তখন ওই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা তথা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। এ কারণে ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব দেয়া হলেও আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা ধারার পরীক্ষার কৃতিত্বকে ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিবেচনা করতে চায় না। জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই বুয়েট, মেডিকেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ন্যূনতম পাস নম্বর অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ভর্তি হলেও পরবর্তী উচ্চশিক্ষা স্তরে গিয়ে অনেকে ইংরেজি ভাষা বা বুনিয়াদি শিক্ষা ভালো না হওয়ায় অকৃতকার্য হয় অথবা কোনো রকমে তৃতীয় শ্রেণী নিয়ে পাস করে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ বছর থেকে পাবলিক মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই এইচএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আন্দোলন গড়ে তোলে। সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা বলেছে, এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো ফলের জন্য পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট কিছু অংশ ভালোভাবে পড়লেই হয়; কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করার জন্য পুরো বই পড়তে হয়। তাই মেধা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা নেয়া হোক। এ কথার অর্থ কি এই নয় যে, খণ্ডিতভাবে পড়েও পরীক্ষায় ভালো করা যায়? আসলে বাস্তবে তাই ঘটছে।

দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয় এখনো নানবিধ সমস্যায় আকীর্ণ। গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট। রয়েছে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব। লাইব্রেরি নেই, ল্যাবরেটরি নেই, নেই প্রয়োজনীয়